কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম
ব্রিফিং নোট
১২

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এজেন্ডা ২০৩০' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-র জুনে নাগরিক সমাজের ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।আর এই ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হয়। দেশব্যাপী এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে এমন ১১৯টি সংস্থা বর্তমানে প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠন হিসেবে যুক্ত রয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারির সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে আসছে।

সংলাপ সম্পর্কে

করোনাভাইরাস অতিমারির কারণে গতবছরের মার্চ মাস থেকে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি বাতিল হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষা। পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং সংক্রামণের হার কমে আসলে সীমিত আকারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার চিন্তা করেছে সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া গাইডলাইন অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রস্তুতিও নেওয়া শুরু করেছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে এই বিষয় বিস্তারিত আলোচনার জন্য এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ এবং এডুকেশন ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহ-আয়োজনে ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখে "অবশেষে স্কুল খুলছে: আমরা কতখানি প্রস্তুত?" শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল সংলাপের আয়োজন করা হয়। যদিও পরবর্তীতে করোনা পরিস্থিতির অবনতি বিবেচনা করে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ খোলার সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেয়া হয়, একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, যখনই এসব প্রতিষ্ঠান আবার খোলা হোক না কেন, প্রয়োজন হবে সুনির্দিষ্ট প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপের। সে বিচারে এই আলোচনাটি আলাদা গুরুত্ব বহন করে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং শিক্ষানুরাগী অনেকেই এই সংলাপে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন।

অবশেষে স্কুল খুলছে
আমরা কতখানি প্রস্তুত?

সূচনা বক্তব্য

কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে প্রায় এক বছর ধরে স্কুল বন্ধ রয়েছে। জনজীবনে চাঞ্চল্য ফিরে আসতে শুরু করেছে এবং অর্থনীতিও তার স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসার চেষ্টা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে ও এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে কীভাবে স্কুল খোলা যায়, সে লক্ষ্যে স্কুলের জন্য বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে। এতদিন স্কুল বন্ধ থাকায় যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নেবার চেষ্টা সবাই করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্কুল খোলার ব্যাপারে আমরা কতখানি প্রস্তুত? বিশেষ করে, ঢাকার বাইরের স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে এই প্রস্তুতির বিষয়টি বড়ভাবে সামনে এসেছে। সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

এসব বিষয়কে সামনে নিয়েই এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ এবং এডুকেশন ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহ-আয়োজনে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে আয়োজন করে "অবশেষে স্কুল খুলছে: আমরা কতখানি প্রস্তুত" শিরোনামে একটি ভার্চুয়াল সংলাপ। অনুষ্ঠানের শুরুতে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম-র আহ্বায়ক এবং সঞ্চালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য হলো দেশের তৃণমূলের বিভিন্ন সংগঠনকে এক জায়গায় নিয়ে আসা এবং তাদের বক্তব্য জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরা।এরই ধারাবাহিকতায় আজ এমন একটি বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করা হয়েছে যার সাথে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবক ও সমাজের অন্যদের ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষক, শিক্ষক নেতৃবৃন্দ, বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যারা ভূমিকা পালন করছেন এবং ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকসহ অনেকেই আজকের এই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন।

স্কুল খোলার ব্যাপারে সবাই প্রায় একমত

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কবে খুলছে, সে ব্যাপারে এখনো সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন ড. মনজুর আহমদ। আলোচনা চলমান আছে এবং সেইসাথে দ্বিধাদ্বন্দ্বও রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়ে ঘোষণা এসেছে। সরকার তার প্রস্তুতির কথা জানালেও এই বিষয় নিয়ে আরো আলোচনার প্রয়োজন আছে। অনুমানের ভিত্তিতে বা আবেগতাড়িত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলে চলবে না; তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নিতে হবে। তিনি এসব বিষয়ে ২০২০ সালের

নভেম্বরের শেষ নাগাদ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম ভাগ পর্যন্ত পরিচালিত একটি জরিপের ফলাফল তুলে ধরেন। সেখানে দেখা গেছে, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রায় ৮০ শতাংশ চাচ্ছেন, এখনই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হোক। কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের মধ্যে কিছুটা দোদুল্যমানতা রয়েছে। তারা আরেকটু দেখেশুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে; তবে সাধারনভাবে বলতে গেলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়াকে সমর্থন করছেন। তবে তারা এই ব্যাপারে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন। খুলে দেওয়ার পর আবার যেন বন্ধ করার পরিস্থিতি না হয়, তাও দেখতে হবে। তবে কোভিড অতিমারির আগের অবস্থায় ফিরে গেলেই চলবে না, যে ক্ষতি হয়েছে তা পোষাতে হবে, এটাই মূল কথা।

ধাপে ধাপে খোলা

ড. মনজুর আহমদ সম্প্রতি এডুকেশন ওয়াচের একটি জরিপের কথা উল্লেখ করে বলেন, একবারে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না খুলে ধাপে ধাপে খুলে দেওয়া উচিৎ। এসব প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে তা করা যায় বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বড় বড় শহরের বাইরে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব তেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সেখানে আগে শুরু করা যেতে পারে। ঢাকা মহানগরে প্রকোপ অনেক বেশি, তাই সেখানে আরেকটু পরে শুরু করা যেতে পারে। আরেকটি উপায় হতে পারে, শিক্ষার স্তর ভেদে খুলে দেওয়া; যেমন, মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ১০ম শ্রেণি দিয়ে শুরু হতে পারে, আর প্রাথমিক পর্যায়ে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণি দিয়ে শুরু হতে পারে। তাহলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাও সম্ভব হবে। সরকারের কাছে এডুকেশন ওয়াচের পরামর্শ ছিল, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হোক।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নেহাল আহমেদ এই প্রসঙ্গে বলেন, স্কুল খুললেও সব একসঙ্গে খোলা হবে না। যেমন, শুরুতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের নিয়ে ক্লাস শুরু করা হতে পারে। ইতমধ্যে তাদের সিলেবাস কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে সেই সংক্ষিপ্ত সিলেবাস শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার সব ধরনের বিষয় মাথায় রেখেই কাজটি করা হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ের অন্যান্য শ্রেণি খোলার ব্যাপারে সর্বশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করা হবে, কেননা স্কুল খুলে দেওয়ার ব্যাপারে এখন যে অভিভাবকেরা মত দিচ্ছেন, দু-একজন আক্রান্ত হলে তারাই আবার হয়তো অভিযোগ করে বলেবেন, কেনো স্কুল খোলা হলো? তখন সব দায় সরকারের ওপরেই পড়বে।তাই এই ব্যাপারে সরকারকে খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে বলে তিনি জানান।

সিলেবাস কাটছাঁট

সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করার বিষয়ে অনেকের মতামতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে শিক্ষক নেতা আবু সাঈদ ভূঁইয়া বলেন, এটা উচিত হবে না। সিলেবাস প্রণয়নে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়, ফলে এক শ্রেণির সিলেবাস শেষ না করলে পরবর্তী শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে মানিয়ে নেওয়া কঠিন। তিনি বলেন, একটি শ্রেণির সিলেবাস শেষ করতে সাধারণত এক বছর সময় লাগে না; ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যেই তা করা সম্ভব। ফলে, এখন স্কুল খুলে গেলে পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসই শেষ করা যাবে। অন্য সবার সিলেবাস সংক্ষিপ্ত না করে শুধু এবার যারা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করা যায় বলে তিনি মত দেন। দেশের অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, ফলে এই মুহূর্তে খুলে দেওয়া হলেও সেখানে ক্লাস নিতে সমস্যা হবে না বলে মনে করেন আবু সাঈদ ভূঁইয়া। সহমত পোষণ করে সিলেবাস সংকোচন করার প্রয়োজন নেই বলে মত প্রকাশ করেন আরেক শিক্ষক নেতা মোঃ আবুল কাশেম। তিনিও সিলেবাসের ধারাবাহিকতার কথা উল্লেখ করে বলেন, যোগ-বিয়োগ না জানলে শিক্ষার্থী ভাগ করতে পারবে না। অটো পাস করে যারা ওপরের শ্রেণিতে উঠল, তাদের আগের শ্রেণির অনেক না পড়া বিষয় বোঝাতে হবে এবং এই কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে কয়েক বছরের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করার বিষয়ে রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, নবম-দশম শ্রেণির জীববিজ্ঞানে শিক্ষার্থীরা এন্ডোস্কপি কী সেটা শিখবে, কিন্তু এটা কীভাবে প্রয়োগ করতে হয়, সেটা তো দরকার নেই।প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে এমন অনেক বিষয় যুক্ত আছে যা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন নেই।বয়স অনুযায়ী শিক্ষণে গুরুত্ব দিতে হবে।দশ বছরের শিক্ষার্থীর জন্য কী প্রয়োজন, এই জায়গা থেকে সিলেবাস সংকুচিত এবং সমৃদ্ধ করার প্রশ্নটি এসেছে।যেহেতু আমরা করোনার কারণে এই সুযোগ পেয়েছি, সেহেতু সিলেবাস সংস্কার বা কারিকুলাম সংস্কারের বিষয়টি নিয়ে ভাবা যেতে পারে।

মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা

অধ্যাপক নেহাল আহমেদ বলেন, এক বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। দূরশিক্ষণ কার্যক্রম যেভাবে পরিচালিত হয়েছে, তা যথেষ্ট কার্যকর বলে প্রমাণিত হয় নি। সে জন্য মধ্যমেয়াদে অন্তত দুই বছরের পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। পাঠ্যক্রম সংক্ষেপিত করতে হবে। সবকিছুই সংক্ষেপ করে পড়ানো হবে, এমনটাই ভাবা হচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণার আলোকে বলা যায়, সব বিষয়ে না পড়ালেও মৌলিক বিষয় যেমন, প্রাথমিকে বাংলা ও গণিত এবং মাধ্যমিকে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান, এই চার বিষয়ে জোর দিতে হবে।

স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ

ড. মনজুর আহমদ বলেন, শুধু কেন্দ্রীয় নির্দেশনা যথেষ্ট নয়। প্রতিটি উপজেলা ও প্রতিষ্ঠানের কথা মাথায় রেখে কীভাবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়, সেই প্রচেষ্টা থাকতে হবে। শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাঝেই কেবল এটি সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, স্থানীয় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে উপজেলা

ভিত্তিক কর্মদল তৈরি করতে হবে। শিক্ষকদের সহায়তা করতে হবে, কীভাবে ক্ষতি পোষানো যায়, পরীক্ষার দিকে না গিয়ে শিক্ষণ কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মশালা করার মাধ্যমে সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সেজন্য আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। সরকারি নির্দেশনায় বলা হয়েছে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো নিজেরা তহবিল জোগাড় করবে। প্রাথমিকের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, তাদের কিছু তহবিল দেওয়া হবে এবং তা থেকে এসব কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। শিক্ষা বাজেট ছিল ৬৬ হাজার কোটি টাকা, এর অন্তত ১০ শতাংশ শিক্ষা পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে ব্যবহার করা দরকার।

অভিভাবকদের আশঙ্কা আছে: নাগরিক প্ল্যাটফর্মের জরিপের ফলাফল

স্কুল খুলে দেওয়ার ব্যাপারে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম-র উদ্যোগে একটি অনলাইন জরিপ পরিচালনা করা হয়েছিল। এই জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করেন সিপিডি-র যুগ্ম পরিচালক অভ্র ভট্টাচার্য। মোট ১ হাজার ৯৬০ জনের ওপর অনলাইনে জরিপটি পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে অভিভাবক ছিলেন ৫৭৬ জন এবং শিক্ষক ছিলেন ৩৭০ জন। বাকিরা অন্যান্য শ্রেণি-পেশার। গত ১৭ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সময়ে এই অনলাইন জরিপ পরিচালনা করা হয়।

জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৫৫ ভাগ (৫৪.৭ শতাংশ) অভিভাবক সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে এখনো নিরাপদ বোধ করছেন না। প্রায় অর্ধেক অভিভাবক মনে করেন, তাদের সন্তানেরা সরকারের জারি করা স্কুল স্বাস্থ্য নির্দেশিকা মেনে চলতে সক্ষম নয়। তবে সন্তানকে পাঠাতে নিজেরা নিরাপদ বোধ না করলেও স্কুল খুলে দেওয়ার পক্ষেই বেশির ভাগ উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন। অভিভাবক ও শিক্ষক বাদে অন্যান্য শ্রেণি-পেশার ৬০.৫ শতাংশ উত্তরদাতা স্কুল খুলে দেওয়ার পক্ষে।আর ৫২ শতাংশ মানুষ স্কুল খুলে দেওয়ার পর সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা করেছেন।

জরিপের মাধ্যমে অভিভাবকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, স্কুল খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার প্রণীত স্বাস্থ্য নির্দেশিকা সম্পর্কে তারা অবগত কি না। জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ৮৭ শতাংশ অভিভাবক বলেছেন, তারা এই স্বাস্থ্য নির্দেশিকা সম্পর্কে অবগত। স্বাস্থ্য নির্দেশিকা মেনে চলতে বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত ব্যয় হবে তা মেটানোর জন্য ৬৭ শতাংশ অভিভাবক বাড়তি ফি দিতে আগ্রহী নন।

৬৮ শতাংশ শিক্ষক স্কুলে যেতে নিরাপদ বোধ করছেন বলে মত দিয়েছেন। সমসংখ্যক শিক্ষক মনে করেন, তাদের স্কুলের স্বাস্থ্য নির্দেশিকা নিশ্চিত করার সামর্থ্য রয়েছে। প্রায় ৬৯ শতাংশ শিক্ষক অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনে সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভর করার কথা বলেছেন। ২৫.৩ শতাংশ শিক্ষক বলেছেন, স্কুলের নিজস্ব অর্থায়নে এই ব্যয়ভার মেটানো উচিত। ৪.৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারী স্থানীয় জনগণের অনুদানের কথা বলেছেন।মাত্র ১.১ শতাংশ অতিরিক্ত ফি নির্ধারণের কথা বলেছেন। আর অভিভাবক ও শিক্ষক বাদে জরিপে অংশ নেওয়া অন্যান্য শ্রেণি-পেশার ৬০.৫ শতাংশ উত্তরদাতা স্কুল খোলার পক্ষে মত দিয়েছেন। ৫৬.৪ শতাংশ উত্তরদাতা সরকারের স্বাস্থ্য নির্দেশিকা বাস্তবায়নযোগ্য বলে মনে করেন।

এই পর্যায়ে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, জরিপে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে স্কুল খোলার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। তবে দুটি জায়গায় শঙ্কা আছে। একটি হচ্ছে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সংক্রমণ আবার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা, অন্যটি হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে যে নিয়ম-নীতির কথা বলা হচ্ছে তা বাস্তবায়নের সক্ষমতার বিষয়ে সন্দেহ আছে। এখানে আর্থিক সংকটের বিষয়টিও এসেছে।

সরকারের অবস্থান

অধ্যাপক নেহাল আহমেদ বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে স্কুল-কলেজ খুলছে কি না, এই বিষয়ে সবার মনেই কৌতূহল। অনেক অভিভাবক এখনই সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে চাচ্ছেন না। আবার বিপুলসংখ্যক অভিভাবক চাচ্ছেন স্কুল খুলে দেওয়া হোক, তাদের সন্তানরা স্কুলে যাক। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সবার মতামত হচ্ছে, আমাদের সন্তানদের আগে সুরক্ষা দিতে হবে, স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে যেন তারা না পড়ে সেটি নিশ্চিত করতে হবে। ছোট ছোট বাচ্চারা যখন দীর্ঘদিন পরে স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের দেখবে, তখন তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরবে, এটাই স্বাভাবিক। আর এই স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই সরকারকে স্কুল খোলার ব্যাপারে খুব সচেতনভাবে ভাবতে হচ্ছে।এই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক জাতীয় পরামর্শক কমিটির সুপারিশ না পাওয়া পর্যন্ত স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হবে, যদিও স্কুল খোলার ব্যাপারে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।এই মুহূর্তে সরকারের বিবেচনায় স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় বা ইউনিয়ন পর্যায়ে স্কুল খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।প্রায় এক বছর স্কুল বন্ধ ছিল।ময়লা-আবর্জনা জমে গেছে।তাই সেগুলো আবার ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।এই ব্যাপারে মহাপরিচালক জিরো টলারেন্সের কথা বলেছেন বলে জানান নেহাল আহমেদ।অর্থাৎ, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকেরা মিলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরোপুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষার আওতায় আনবেন।জানা গেছে, বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রস্তুতি নিচ্ছে। অবকাঠামোর দিক থেকে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই এখন তৈরি। সেদিক থেকে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে যেকোনো সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করা সম্ভব।তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিন স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় শিশুদের শিক্ষার যতখানি ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়েও বেশি ক্ষতি হয়েছে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের।তাই এই মুহূর্তে শিশুদের পড়াশোনার ক্ষতির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায়।এই ব্যাপারে অভিভাবকদের আরও বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন।তবে স্কুল শুরু হয়ে গেলে ধীরে ধীরে আগের গতি ফিরে আসবে বলে তিনি মনে করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের মহা পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ গোলাম ফারুক বলেন, তিনি সহ অন্য কর্মকর্তারা এখন ঢাকার বাইরেই বেশি সময় কাটাচ্ছেন; প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কী অবস্থা, তা বোঝার চেষ্টা করছেন।বিশদ দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।এটা অনুসরণ করা বেশ কঠিন।তবে মৌলিক শর্তগুলো পূরণ করার চেষ্টা চলছে, যেমন-ইনফ্রারেড থার্মোমিটার জোগাড় করা, বসার জায়গা নির্ধারণ করা, হাত ধোয়ার জায়গা নতুন করে নির্মাণ করা ইত্যাদি।এমনকি অনেক স্কুলে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ আইসোলেশন সেন্টারও করা হয়েছে।তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলো আর্থিক সমস্যার কারণে এসব ব্যবস্থা করে উঠতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।এই ব্যাপারে নির্দেশনা হচ্ছে, সমস্যা থাকলে সরকারকে জানাতে হবে, সরকার তা নিরসনের চেষ্টা করবে।সরকার এটা শতভাগ নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে।অনেক এনজিও আশ্বাস দিয়েছে, এসব সমস্যার ক্ষেত্রে তারাও এগিয়ে আসতে পারে।তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় কথা হলো, সরকার স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চায়।এই জন্য সমাজের সব স্তরের মানুষের সমর্থন লাগবে।সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, গত এক মাসে এক লাখ শিক্ষককে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।অনেকের শঙ্কা, শিক্ষার্থীরা মানসিক সংকটের সম্মুখীন হতে পারে।এই লক্ষ্যে দুই মাস আগেই মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক মডিউল তৈরি করা হয়েছে।এই মডিউলের লক্ষ্য হচ্ছে, বিদ্যালয় খোলার পর শিক্ষার্থীর মধ্যে মানসিক সমস্যা দেখা গেলে শিক্ষক যেন প্রাথমিকভাবে পরামর্শ দিতে পারেন।সমস্যা বড় আকার ধারণ করলে শিক্ষকেরা রেফার করবেন।এছাড়া শিক্ষার্থীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে স্কুলে স্কুলে আয়রন ফলিক অ্যাসিড পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।মূলত মেয়েদের লক্ষ্য করে এটা করা হয়েছে।ওজন মাপার যন্ত্র দেওয়া হয়েছে।শিক্ষার্থীদের বডি মাস ইনডেক্স তৈরি করার কথাও বলে হয়েছে।

বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গে প্রফেসর সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক বলেন, আগে শিক্ষার্থীরা প্রতি বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করত।এখন সরকার মনে করছে, শিক্ষার্থীরা দলে দলে ভাগ হয়ে প্রতিদিনই এটা করবে।এই সংস্কৃতি চালু করতে চায় সরকার।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য স্কুলের আয় এবং স্বাস্থ্য উপকরণ কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক বলেন, 'টাকা পাচ্ছে না, এই রকম অভিযোগ আমরা এখনো পাইনি।তবে আমার জানার বাইরেও অনেক কিছু থাকতে পারে।সে ক্ষেত্রে নির্দেশনা হলো, জানানো মাত্র যেন টাকা দেওয়া হয়। শিগগিরই সরকার একটি কমিটি গঠন করে দেবে-শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও সবাই সেখানে থাকবে।সবাইকে নিয়েই কাজটা করতে হবে।

সৈয়দ গোলাম ফারুকের কথার ইতিবাচকতা তুলে ধরে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সবাইকে নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর জোর দেন।

সচেষ্ট শিক্ষক সমাজ

বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবু সাইদ ভূঁইয়া বলেন, শিক্ষার্থী-অভিভাবকসহ পুরো জাতি এখন স্কুল খোলার অপেক্ষায় আছে। এমন পরিস্থিতিতে এই আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রশংসা করেন তিনি। কিছুদিন আগে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (মাউশি)-এর উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেখানে সব শিক্ষক বিদ্যালয় খোলার পক্ষে কথা বলেছেন। তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সব করতে চান। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য তহবিল আছে জানিয়ে তিনি বলেন, এই তহবিলে এত দিন ধরে যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হয়েছে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য সেটাই যথেষ্ট। বিদ্যালয়গুলো সামান্য পরিমাণ ফি নির্ধারণ করলে বা তার বদলে সরকার অনুদান দিলেই সমস্যা মিটে যাবে বলে তিনি মনে করেন। তবে তার মত হচ্ছে, স্বাস্থ্য বিধানসমূহের মান্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কিছু কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬০ জন হলে ৩০ জনে দুই ভাগ করে ক্লাস নেওয়া যায়। আবার এক শ্রেণি থেকে আরেক শ্রেণির মাঝে শিক্ষার্থীরা নানাভাবে আনন্দ উল্লাস করে-পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। এটা থেকে তাদের বিরত রাখা যায় না। সে জন্য তাদের প্রস্তাব, শ্রেণিকক্ষ থেকে এক শিক্ষক যাওয়ার আগেই আরেক শিক্ষক চলে আসবেন, তা না হলে শিক্ষার্থীরা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

সুনামগঞ্জের ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষক তাকমিনা খাতুন বিদ্যালয় খোলার প্রস্তুতি সম্পর্কে বলেন, বিদ্যালয় পরিষ্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব নেওয়া হয়েছে এবং তিনি জানান সরকারি বিদ্যালয়গুলোতেও একই ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া, স্কুল বন্ধ থাকার কারণে বাল্য বিবাহ অথবা স্কুল বন্ধ থাকায় মাদ্রাসায় চলে যাওয়ার বিষয়ে প্রশ্নের অবতারণা করলে রাজশাহী থেকে স্কুলের শিক্ষক সিনারা খাতুন এই প্রসঙ্গে বলেন, তার স্কুল থেকে একজন শিক্ষার্থী মাদ্রাসায় চলে গেলেও পরবর্তীতে যোগাযোগ করলে সে আবার স্কুলে ফেরত এসেছে।

স্কুল শিক্ষক আবুল কাশেম বলেন, স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে তারা অবগত। এখন কীভাবে শিক্ষার্থীদের তা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা যায়, সেই বিষয়ে চেষ্টা চলছে। এই লক্ষ্যে মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নিয়মিত বার্তা আদান-প্রদান চলছে। বিদ্যালয় খোলার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা রোস্টার করে বিদ্যালয়ে যাচ্ছেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। শিক্ষকেরা টিকা নেওয়া শুরু করেছেন। তিনি নিজে টিকা নিয়েছেন জানিয়ে আরও বলেন, সবাইকে টিকা গ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সিরাজগঞ্জ থেকে শিক্ষক চম্পা রানি সাহা বলেন, 'আমাদের ১,৬০০ ছাত্রছাত্রী আছে। তাদের কীভাবে বসিয়ে ক্লাস করাবো, সেটাই বুঝতে পারছি না। সেজন্য অবশ্যই এনজিওদের সহযোগিতা নিতে হবে।

পঞ্চগড় থেকে শিক্ষক সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ‘আমাদের গভর্নিং বডির সদস্য এবং অভিভাবক সবাই স্কুল খুলে দেওয়ার পক্ষে।আমরা সরকারের নির্দেশমতো স্বাস্থ্যবিধিও নিশ্চিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।এত দিন অনলাইনে ক্লাস হয়েছে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সব শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পেরেছে।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা স্কুল খোলার পক্ষে

ময়মনসিংহ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী সিয়ন্তি আকতার বলে, ‘আমি মুখে মাস্ক লাগিয়েই স্কুলে যেতে চাই’। জামালপুর থেকে ফাতেমা বেগম নামের একজন অভিভাবক বলেন, ‘আমি ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে চাই। বাসায় ভালোভাবে পড়াশোনা হচ্ছে না। স্কুল থেকে সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে শুনে নিরাপদবোধ করছি। এ ছাড়া করোনা আসার পর থেকে বাসায় ওদের আরও বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকার অভ্যাস করিয়েছি। তারা টিকা নিতে চান বলে তিনি জানান। রাজধানীর মিরপুর থেকে সাইদা ইয়াসমিন নামের একজন শিক্ষক স্কুল খোলার ব্যাপারে তার ইতিবাচক মতামতের কথা জানান এবং বলেন, স্কুল থেকে যদি সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্লাস চালু করা হয়, তাহলে সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে নিরাপদবোধ করবেন।

বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতি-এর সেক্রেটারি জেনারেল মোঃ সাখাওয়াত হোসেন বলেন, সরকার প্রদত্ত সব ধরনের নির্দেশনা পালন করা হচ্ছে। শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করা, থার্মাল স্ক্যানার কেনা, পর্যাপ্ত পরিমান স্যানিটাইজার ও মাস্ক কেনা-এই কাজগুলো হয়েছে। এখন সমস্যা হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ছাত্রদের পাঠ দেওয়া। তাদের শ্রেণিকক্ষ আছে পাঁচটি-পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী আছে ৮৫ জন। এ অবস্থায় শুধু ৮৫ জনকে ৫টি শ্রেণিকক্ষে যতটুকু সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বসানো যায়। ফলে অন্য শ্রেণির ক্লাস নেওয়া সম্ভব হবে না। তিনি আরও বলেন, করোনার সময়ে সাধারণ স্কুল বন্ধ থাকলেও কওমি মাদ্রাসাগুলো চালু আছে। স্কুলের অনেক ছাত্র সেখানে চলে গেছে। তাই এখন স্কুল খোলা হলেও অনেক ছাত্র ঝরে যাবে এমন আশঙ্কা আছে। এ ছাড়া কেজি স্কুলগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে অনেক আগেই। কিছু শিক্ষার্থী সেখানেও চলে গেছে। ফলে আমাদের স্কুল চালু করার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের বেশ চাপ রয়েছে, যদিও সরকারের নির্দেশনার বাইরে কিছু করা উচিৎ হবে না।

হবিগঞ্জ থেকে অভিভাবক ঝুমা ভট্টাচার্যের সন্তান অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছে এবং তিনি মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান। হবিগঞ্জের স্কুল কমিটির সভাপতি ইকবাল হোসেন বলেন, শ্রেণিকক্ষ ও আঙিনা পরিষ্কার করা হয়েছে। কমিটি শিক্ষার্থীদের মাস্ক দেবে। পাশাপাশি মাস্ক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হবে। এ ছাড়া প্রতি বেঞ্চে তিনজন ছাত্র বসবে, এই ব্যবস্থায় শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করা হবে। কিশোরগঞ্জের ৯ম শ্রেণির ছাত্র তাহমিদুল ইসলাম বলেন, এক বছরে অনেক ক্ষতি হয়েছে। বিদ্যালয় খোলার পর তাহমিদুল সতর্ক থাকবে বলে জানান। ৯ম শ্রেণির সুরাইয়া আক্তার বলেন, বিদ্যালয় খোলার পর কী করতে হবে সে বিষয়ে তিনি জানেন। নওগাঁর ১০ম শ্রেণির ছাত্রী রুমি রাণী লাকড়া বলে, স্বাস্থ্যবিধান মেনে এখন বিদ্যালয় খুলে দেওয়া দরকার। বন্ধ থাকার কারণে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয়েছে। গাইবান্ধা থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী মনীষা রানী বলেন, “আমি গাইবান্ধার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক বিদ্যালয়ের ছাত্রী। সেখানে স্কুল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ নেই। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ক্লাস হলেও আমি সেখানে যুক্ত হতে পারিনি”। কুড়িগ্রাম জেলার রতনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী বলে, “গত এক বছর আমরা ব্যক্তিগতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, মাস্ক পরা, স্যানিটাইজেশন করা এসব কাজে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এখন স্কুল খোলাটা খুব জরুরি। কেননা অনলাইনে ৯৫ শতাংশ শিক্ষার্থীই অংশগ্রহণ করতে পারছে না। আমাদের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র শিক্ষার্থীরা টিউটরের কাছেও পড়তে পারছে না। তাই স্কুলের পড়াটা আমাদের খুব দরকার”। হবিগঞ্জের ১০ম শ্রেণির ছাত্রী নূপুর দাস বলেন, এক বছরে অনেক ক্ষতি হয়েছে। তাই বিদ্যালয় খুলে দেওয়ার বিকল্প নেই। এসএসসির যে সংশোধিত সিলেবাস দেওয়া হয়েছে, ক্লাস শুরু না হলে তা শেষ হওয়া সম্ভব নয়। নওগাঁ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী সঞ্জয় বলে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দিলে খুব ভালো হয়।তা না হলে অনেকের বাল্যবিবাহ হয়ে যাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতামত

ইকোনোমিক রিসার্চ গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক ড. সাজ্জাদ জহির বলেন, ইকোনোমিক রিসার্চ গ্রুপের পক্ষ থেকে কয়েকটি স্কুল পরিদর্শন করার সুযোগ হয়েছে।সেই আলোকেই তিনি নীতি-নির্ধারক ও গবেষকদের উদ্দেশে বলেন, করোনাকালীন স্কুলিংয়ের ধরন বদলে গেছে-অনলাইনভিত্তিক হয়েছে। অর্থাৎ স্কুল একেবারে বন্ধ ছিল, তা বলা যাবে না। দ্বিতীয়ত, স্কুল খোলার ব্যাপারে হ্যাঁ বা না শুধু সংখ্যাগত দিক থেকে না দেখে আমরা যদি দেখতাম, কারা হ্যাঁ বলছে আর কারা না বলছে, তাহলে ভালো হতো। সেটার সঙ্গে আবার সিকোয়েন্সিং দরকার। সরকারের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা হয়তো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। তিনি বলেন, সবখানেই কিছু ঝুঁকি থাকবে। বোর্ড কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বুঝেশুনে ঝুঁকি নিতে হবে। সাজ্জাদ জহির বলেন, গবেষণার দিক থেকে আমরা হয়তো সাহায্য করতে পারব। কোন জায়গায় স্কুল খোলার পক্ষে মত বেশি, তা বুঝতে বিষয়টি আরেকটু খতিয়ে দেখা উচিত। মাউশির ওপর নির্ভরশীলতা গড়ে উঠেছে, কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সংস্কৃতি থাকতে হবে। শুধু তা-ই নয়, তাকে শক্তিশালী করার বিষয়টিও ভেবে দেখা দরকার। কেন যেন মনে হয়, শিক্ষার ব্যাপারে সবকিছু উচ্চমহলের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। এটা শিক্ষার জন্য খুব বিপজ্জনক। এটা আমাদের সবারই অনুধাবন করা উচিত। এসডিজি নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এই বিষয়টা নিয়ে আরও গুরুত্ব সহকারে ভাবা দরকার। এর মাধ্যমে শিক্ষার মূলে আঘাত দেওয়া হচ্ছে। মস্তিষ্ক চর্চার ক্ষেত্রে জাতি পরনির্ভর হয়ে পড়ছে। তিনি আরও বলেন, “বেশ কয়েকটি মফস্বল শহরের স্কুলে আমরা গিয়েছি। সেখানে দেখেছি, কাগজে-কলমে শতভাগ সচেতনতা আছে। তবে বাস্তব প্রয়োগ অসম্ভব। লোকজন সহজভাবে নিতে পারলে কিছু ঝুঁকি নেওয়া যায়”। হেলথ অ্যাডভাইজিং কমিটির টার্মস অব রেফারেন্সে শিক্ষা বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার নেই। দরকার হচ্ছে সরাসরি সিদ্ধান্ত নেওয়া, যেখানে

প্রয়োজন সেখানে চালু করে দেওয়া। মানসিক স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার যে প্রচণ্ড ব্যত্যয় ঘটেছে, সেটাও এই কারণে। তার ধারণা হচ্ছে, নির্দেশনার চেয়েও জরুরি হচ্ছে প্রশিক্ষণ। কেননা অনেক স্কুলেই এখনো থার্মোমিটার কেনা হয়নি। টাকা দেওয়া হয়েছে কি হয়নি, সেটাও তিনি জানেন না উল্লেখ করে বলেন, এজেন্সিগুলো মনিটরিংয়ের ভূমিকায় যেতে পারে না। এরা কার্যক্রমের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম বলেন, এক বছর ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে বন্ধ রয়েছে তা থেকে আমরা কিছু শিক্ষা নিতে পারি। তিনি বলেন, ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা আমাদের কতটুকু? দেখা যাচ্ছে, ইবোলা মহামারি আফ্রিকায় দুই বছরের মধ্যে আবার ফিরে এসেছে। শফিকুল ইসলাম বলেন, একটি শিক্ষা হচ্ছে যে, আমরা এতদিন টেলিভিশনে বা অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছি। তবে অনলাইনে ক্লাস নিতে গিয়ে আমাদের সমস্যা হয়েছে ইন্টারনেটের মূল্যের কারণে। ব্র্যাকের পক্ষ থেকে কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে ক্লাস নেওয়া হয়েছে। তবে প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের পক্ষে টেলিভিশন বা অনলাইনের শিক্ষা কার্যক্রম অনুসরণ করা সম্ভব নয়। আবার গ্রামে সেই সুযোগও নেই। এই সমস্যা কেন্দ্রীয়ভাবে মোকাবিলা করতে হবে। ইন্টারনেটের কথাই বলা যায়, এই সংযোগ কতটা স্থিতিশীল বা বিস্তৃত। এই সমস্যা সরকারকে মোকাবিলা করতে হবে। কথা হচ্ছে, এটা কি নীতির ব্যাপার, নাকি প্রণোদনার ব্যাপার। দুই মাস পরে মহামারি আবার বিস্তৃত হলে কী হবে, সেই পরিকল্পনাও থাকা দরকার। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বাজেট আসছে। শফিকুল ইসলাম মনে করেন, এখনই এইসব বিষয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে।

প্রশাসনের প্রস্তুতি

টাঙ্গাইলের জেলা শিক্ষা অফিসার লায়লা খানম বলেন, স্কুল খোলার জন্য প্রশাসনের প্রস্তুতি আছে। সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে এই কাজে যুক্ত হতে চান। শিক্ষকদের টিকা নেওয়ার তাগিদ দেওয়া হচ্ছে।তারাও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ব্যাপারে সচেষ্ট। এমনকি অনলাইন ক্লাস তদারকির জন্যও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। সেখানে কিন্তু শিক্ষকরাও আসছেন। স্কুল থেকে অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছেন।

নাগরিক সমাজের পরামর্শ

সেইভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ-এর পরিচালক, প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোয়ালিটি, রিফাত বিন সাত্তার বলেন, সবাই মোটামুটি এক ব্যাপারে একমত, বিদ্যালয় খোলাটা জরুরি।এক বছরে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে, তার প্রভাব সরাসরি শিক্ষার্থীদের ওপর পড়েনি, যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক তার উল্টো।সরকার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।তবে শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফেরানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। অনেক শিক্ষক আশঙ্কা করছেন, শিক্ষার্থীদের অনেকেই বিদ্যালয়ে ফিরবে না। সচেতনতামূলক প্রচারণা দরকার। তিনি বলেন, বাংলাদেশে দুর্যোগের পর দেখা যায়, পরিবারের ক্ষতি মোকাবিলায় শিশুদের স্কুল ছাড়িয়ে শ্রমে নিয়োজিত করা হয়। বাল্যবিবাহও বেড়ে যায়। দীর্ঘমেয়াদি বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে এই আশঙ্কা আরও বেশি। সেক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বলেন, কারিকুলাম বাড়িয়ে বা কমিয়ে সমস্যা মোকাবিলা করা হয়তো সম্ভব নয়। সে জন্য সমন্বিত তৎপরতা দরকার। টার্গেট করে এই কাজটা করতে হবে। বাংলাদেশের সব জায়গার পরিস্থিতি এক রকম নয়, তা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, চরাঞ্চল ও ঢাকার অবস্থার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ফেরানোর লক্ষ্যে সেইভ দ্য চিলড্রেন সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুরু করেছে বলে তিনি জানান। বাল্যবিবাহ ও ঝরে পড়া রোধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া হয়েছে এই প্রচারণায়। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, যারা অনলাইনে ক্লাস করেছে, তারা কোন না কোন ভাবে শিক্ষার আওতায় ছিল। কিন্তু বেশির ভাগ শিশুই সেই সুযোগ পায়নি।

দিনাজপুর থেকে বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আবু এ হিয়া বলেন, অবস্থাপন্ন পরিবারের শিক্ষার্থীদের তুলনায় গরিব পরিবারের শিক্ষার্থীরা বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। অনলাইনে ক্লাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অনলাইন পড়াশোনা কার্যকর হচ্ছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের দ্রুত বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা দরকার। ওয়ার্ল্ড ভিশনের পরিচালক টনি মাইকেল গমেজ বলেন, আজকের আলোচনায় একদিকে যেমন সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মুখে প্রস্তুতির আত্মবিশ্বাস শুনতে পাচ্ছি, ছাত্রছাত্রীদের মুখে আগ্রহের কথা শুনতে পাচ্ছি, আবার অভিভাবকদের মুখে উৎকণ্ঠাও শুনতে পাচ্ছি। ফলে এর সমন্বয়টা কীভাবে হবে, সে বিষয়ে ভাবা জরুরি।

ঢাকা থেকে উন্নয়ন কর্মী জনাব জাহাঙ্গীর বলেন, সবাই স্কুল খুলে দেওয়ার পক্ষে মতামত দিয়েছে। তবে সেজন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দরকার, এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবার সমন্বিত অংশগ্রহণ, বিশেষ করে বেসরকারি সংগঠনগুলোর সমন্বয় থাকবে কি না, সে বিষয়ে সংশয় আছে। তিনি মনে করেন, স্কুল খোলা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বার্তাগুলো রেডিও/টেলিভিশনে সম্প্রচার করা যেতে পারে।

সিপিডি-র সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান একটি বিভ্রান্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, দুজন বক্তা বলেছেন; শিক্ষার্থীরা কওমি মাদ্রাসায় চলে গিয়েছিল, যদিও তাদের আবার ফিরিয়ে আনা গেছে। তার মানে কি কওমি মাদ্রাসা খোলা ছিল? এখানে কওমি মাদ্রাসার অভিজ্ঞতার কথা আমরা শুনতে পারলাম না। এই পর্যায়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, একটি সময় কওমি মাদ্রাসা খুলে দেওয়া হয়। মোস্তাফিজুর রহমান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেন কওমি মাদ্রাসার বিষয়টিকে নজরে রাখেন সেই আহ্বান জানান। অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ এই আলোচনার সূত্র ধরে বলেন, প্রাথমিক ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষার্থীদের অনেকে কওমি মাদ্রাসায় গেছে, পত্রিকার এক কলাম থেকে জানার পর তিনি এই বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। তিনি মনে করেন, মূল সমস্যা হচ্ছে সমন্বয়হীনতা। আবার সবকিছু নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমেও হবে না।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, বিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে সরকার এক পা এগোচ্ছে আবার দুই পা পেছাচ্ছে। অন্যদিকে বিদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের যে সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে, এখানে সেটা নেই; তাদের আরও সক্রিয় হওয়া দরকার। তিনি আরও বলেন, বিদ্যালয় খোলার আগে এলাকায় মাইকিং করা প্রয়োজন। ক্লাস রুটিন পুনর্বিন্যাস করা দরকার। আগের কাঠামো দিয়ে এই সমস্যা মোকাবিলা করা যাবে না। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা আমলে নিতে হবে। শিক্ষক সংগঠনগুলোর ব্যাপারে তিনি বলেন, শুধু দাবি-দাওয়া আদায়ের মধ্যে না থেকে কীভাবে শিক্ষার্থীদের এই এক বছরের মানসিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠায় সহযোগিতা করা যায়, সেদিকেও তাদেরকে নজর দিতে হবে এবং এক্ষেত্রেও অভিভাবকদের আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে হবে। বাল্য বিবাহ ও ঝরে পড়ার কথা আলোচনায় এসেছে কিন্তু শিশু শ্রমের কথা নিয়েও আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

শিক্ষাবিদ রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, আজকের অনুষ্ঠানের বড় অর্জন হচ্ছে, এখানে মাটির গন্ধ এবং মাঠের সুবাস পাওয়া যাচ্ছে। চারটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেন তিনি। প্রথমত, সরকার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছে, সক্ষমতা আছে, বাড়াতে হবে-এই নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, কিন্তু আর্থিক সংস্থান নিয়ে কথা হয়নি। অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে প্রণোদনা দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে প্রণোদনা দেওয়া হয়নি। সামান্য কিছু ভাতা দেওয়া হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি প্রণোদনাও দেওয়া দরকার। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার কর্মসূচি একবার চালু হয়েছিল, পরে সেটা থমকে গেছে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে এটা আবার চালু করা উচিত। তা না হলে ফিরিয়ে আনার পরদিন তারা আবার ঝরে পড়তে পারে, কারণ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী এখনো খাদ্য নিরাপত্তা ও আয় নিরাপত্তার ঝুঁকিতে আছে। দ্বিতীয়ত, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার বড় ভূমিকা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, তারা স্থানীয় পর্যায়ে এই ধরনের সংলাপ আয়োজন করতে পারে। প্রচারণা সঠিকভাবে করতে হবে। স্কুল খোলার পর জোরালোভাবে মনিটরিং করতে পারে। নাগরিক সমাজের আন্দোলনে গণমাধ্যমের বড় ভূমিকা আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ ছাড়া সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে এই কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ আরও বেশি উদ্বুদ্ধ হতে পারে, সচেতন হতে পারে।বেসরকারি খাতকেও এসব কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করতে হবে বলে তিনি মনে করেন। তৃতীয়ত, সরকার নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট নিশ্চিত করলেও ইন্টারনেট সেবাদাতারা কীভাবে আরও সুলভে এই সেবা সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। চতুর্থত, তিনি মনে করেন, সবকাজ সরকারের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। স্কুলে শিক্ষার্থীদের ফিরিয়ে আনা, এটা সরকারের একার কাজ নয়, তাদের আবার পঠনপাঠনে মনোনিবেশ করানো, মনোজগতে যে ক্ষতিটা হচ্ছে সেটা পোষানো, এই সবকিছুই সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকার, এনজিও, নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি খাত সবাই মিলে সমন্বিতভাবে কাজগুলো করতে হবে।

সমাপনী বক্তব্য

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, স্কুল খোলার ব্যাপারে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক নির্বিশেষে সবাই ঐকমত্যে এসেছেন। তবে দ্বিধা আছে, ভয় আছে, কিছুটা ঝুঁকি আছে, সেই অর্থে কিছু দুঃশ্চিন্তাও আছে। তিনি বলেন, প্রস্তুতির ব্যাপারে একটা মিশ্র চিত্র আমাদের সামনে এসেছে। বেসরকারি স্কুলগুলোতে যে জোরালো প্রস্তুতির কথা আমরা শুনেছি, সেটা সরকারি বা এমপিওভুক্ত স্কুলগুলো থেকে অতটা জোরালোভাবে শোনা যায়নি। তারা প্রস্তুতির ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।ডিজিটাল পদ্ধতিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার সুযোগ সবাই সমানভাবে পায়নি। ফলে ডিজিটাল বৈষম্য কীভাবে দূর করা যাবে, আগামী দিনে তা একটা বড় বিষয় হয়ে উঠবে। শহরাঞ্চলের স্কুলগুলো যতখানি প্রস্তুত, চর, হাওর, নদীভাঙন, দুর্গম অঞ্চল, আদিবাসী সম্প্রদায় অধ্যুষিত স্কুলগুলো ততখানি প্রস্তুত নয়। তিনি বলেন, এই সময়ে বা স্কুল খোলার কিছু আগে বাল্যবিবাহ এবং শিশুশ্রমের যে নেতিবাচক প্রবণতা, বেকার শিক্ষকদের যে অসুবিধা, মূল ধারার শিক্ষা থেকে যারা ধর্মীয় শিক্ষায় চলে গেছে, তাদের কীভাবে আবার মূল ধারায় ফিরিয়ে আনা যাবে, এসব আগামী দিনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আসবে বলেই মনে হচ্ছে। এসডিজি বাস্তবায়নের ওপর এসবের কী প্রভাব পরবে, সেটা আরও বড় অলোচনার বিষয়।

স্কুল খোলার ব্যাপারে যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, সেটা মোকাবিলার দুটি পদ্ধতি আছে বলে মনে করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, সবার আর্থিক সংগতি সমান নয়। সরকারের পক্ষ থেকে এককালীন সুবিধা দেওয়া যায় কি না সে বিষয়ে ভেবে দেখতে হবে। ভর্তুকি বা অর্থায়ন যাকে প্রণোদনা বলা হচ্ছে, এই মুহূর্তে স্কুল খোলার জন্য এসব অবশ্যই প্রয়োজন। বিভিন্ন মহল থেকে এর প্রয়োজনীয়তা এবং এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে, কেননা স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা না দিতে পারলে ঝরে পড়া রোধ সম্ভব হবে না। এই জন্য সরকার, এনজিও ও বেসরকারি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে কাজগুলো করতে হবে এবং এইসব কাজে সমন্বয় বিধান করতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতা। সমন্বয় জোরদার করতে হবে। এখানে শিক্ষকদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। সমন্বয়ের পাশাপাশি নজরদারির বিষয়টিও খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং বিষয়টি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বা সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রচারণা আরও বেশি জোরদার করতে হবে, যাতে পুরো দেশ একসঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

যে মিশ্র চিত্র আমরা দেখছি সেখানে আরও একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে- অটো পাশ বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাস; আগামী দিনে আমরা কীভাবে এটা মোকাবিলা করব তা আমাদের ভাবতে হবে। এটা দুর্যোগের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসাবে বিষয়টি এসেছে। কিন্তু এটা মোকাবিলা করতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে। সিলেবাস সংকোচনের বিরুদ্ধে জোরদার মতামত এসেছে। আবার শিক্ষা কার্যক্রম কীভাবে পুনর্বিন্যাস করা যায়, সে ব্যাপারেও মতামত এসেছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এসব কিছুর ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নাজুক পরিস্থিতি উন্মোচিত হয়েছে। উদ্ভূত

পরিস্থিতিকে আমরা যদি একটি সুযোগ হিসাবে দেখি ও মধ্যমেয়াদি সংস্কার কার্যক্রমগুলি গ্রহণ করি তবে আমরা শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারবো। বাংলাদেশের আগামী দিনের অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা। এই ব্যাপারে কারোরই দ্বিমত নেই এবং আলোচনায় এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আগামী দিনেও এই আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। পরিশেষে প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য অনুষ্ঠান শেষ করেন।

Platform Briefing Notes

Briefing Note 01: **Strengthening Effectiveness of the Non-State Actors' in COVID-19 Response Activities.** (June 2020)

Briefing Note 02: **Post-'General Holidays' Health Risks.** (June 2020)

Briefing Note 03: **New Challenges for SDGs and Budget 2020-21.** (October 2020)

Briefing Note 04: **Experiences From the Current Situation at the Grassroots Level.** (October 2020)

Briefing Note 05: **Voluntary National Review 2020 and Youth Perspectives.** (October 2020)

Briefing Note 06: **Post-Pandemic Status of CMSMEs and Effectiveness of Stimulus Packages.** (February 2021)

Briefing Note 07: **Proposed City Court Act in Bangladesh: Challenges of Implementatio**. (March 2021)

ব্রিফিং নোট ০৮ : কোভিড ১৯ টিকা: বাংলাদেশে কে, কখন, কীভাবে পাবে? (জানুয়ারি ২০২১)

Briefing Note 09: **Why is the Price of Rice Rising? Who Gains, Who Loses?** (February 2021)

Briefing Note 10: **Remittance Flows in Recent Times: Where from is So Much Money Coming?** (February 2021)

ব্রিফিং নোট ১১ : কালো টাকা সাদা হচ্ছে: অর্থনীতির লাভ, না ক্ষতি? (Upcoming)

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

সভাপতি

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
আহ্বায়ক
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

বিশেষ অতিথি

রাশেদা কে চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান ও
কোর গ্রুপ সদস্য
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

প্রারম্ভিক উপস্থাপনা

ড. মনজুর আহমদ
প্রধান গবেষক, এডুকেশন ওয়াচ
ও
ইমেরিটাস অধ্যাপক
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

জরিপের ফলাফল উপস্থাপন

অভ্র ভট্টাচার্য
যুগ্ম পরিচালক, সংলাপ ও যোগাযোগ বিভাগ
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

আলোচকবৃন্দ

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রফেসর নেহাল আহমেদ
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

প্রফেসর ড. গাজী হাসান কামাল
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ময়মনসিংহ

লায়লা খানম
জেলা শিক্ষা অফিসার
টাঙ্গাইল

আবু সাঈদ ভূঁইয়া
সভাপতি
বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি

মোঃ আবুল কাশেম
সভাপতি
বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতি

ড. সাজ্জাদ জহির
নির্বাহী পরিচালক
ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ (ইআরজি)

ড. শফিকুল ইসলাম
পরিচালক, শিক্ষা কর্মসূচি
ব্র্যাক

রিফাত বিন সাত্তার
পরিচালক, প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোয়ালিটি
সেভ দ্য চিলড্রেন, বাংলাদেশ

রফিকা আফরোজ
বাংলাদেশ শিক্ষক ফেডারেশন

টনি মাইকেল গমেজ
ডিরেক্টর - টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম, কমিনিউকেশন, এডভোকেসি
ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ
প্রধান সমন্বয়কারী
জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: **প্রতীক বর্ধন** এবং **অন্বেষা জাফরিন**
সিরিজ সম্পাদনায়: **অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান**
সহযোগী সম্পাদক: **অভ্র ভট্টাচার্য**

সহ-আয়োজক

এডুকেশন ওয়াচ
গণসাক্ষরতা অভিযান — Campaign for Popular Education

সহযোগী প্রতিষ্ঠান

UNDP · actionaid · Canada · Centre for Policy Dialogue · christian aid · Friedrich Ebert Stiftung · ICCO Cooperation · Plan International · WaterAid

www.bdplatform4sdgs.net   BDPlatform4SDGs   BDPlatform4SDGs

এপ্রিল ২০২১

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net